প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনঃ তাজউদ্দীন আহমদের অবদান

বিশ্বের ইতিহাসে কয়েকটা রাষ্ট্র সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। এদের প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করে। এই যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জেনারেল চার্লস দ্য গলের স্বাধীন ফরাসি সরকার। কিংবা পোল্যান্ডের প্রবাসী সরকার যার কার্যালয় ছিল লন্ডন[১]।তাছাড়া আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধও (১৭৭৫-১৭৮৩) পরিচালিত হয়েছে একটি বিপ্লবী সরকারের অধীনে[২]। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বেশ মিল পাওয়া যায়। তুলনামূলক ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বিশ্লেষণের একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। একই সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকাকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে একটি সার্বভৌম বিপ্লবী সরকারের অধীনে। বাংলাদেশেরও তাই। মার্কিনীদের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন সহযোগিতা করে ফ্রান্স তেমনি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করে ভারত[৩]। মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা ও সরকার গঠন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় যেমন সে দেশের জাতীয় নেতা Willam Jefferson (১৭৪৩-১৮২৬) ও আর কজন নেতা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে তেমনি, বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) ও তৎকালীন আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের এই তাত্ত্বিক গুরু যেমন Declaration of Independence নামক সনদ ঘোষণা করে[৪] তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সহযোগিতায় তাজউদ্দীন আহমেদ।

তবে পৃথিবীর অন্যান্য প্রবাসী সরকারের তুলনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার খুব দ্রুত সময়ে মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা অর্জন করে। কারণ এই সরকার ছিল কাজে নিষ্ঠাবান, কূটনৈতিক সম্পর্কে ছিল খুবই তৎপর, পরিকল্পিত ও ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ছিল সুসংগঠিত। আর এই সরকারের নেতৃত্বে ছিল ঠাণ্ডা মাথার ধীরস্থির চিন্তাশীল মানুষ, অপরিমেয় দূরদর্শী, আদর্শবান, আপোষহীন নেতা তাজউদ্দীন আহমদ। এ প্রসঙ্গে এইচ টি ইমাম বলেন, প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে এই সরকার গঠন করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একদিকে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব অন্যদিকে এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণব্যবস্থা, দেশের অভ্যন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতা, যুবাদেরকে যুবশিবিরে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্থানিদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা এবং সাথে সাথে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি- এ সবই ছিল প্রবাসী সরকারের অবিস্মরণীয় কীর্তি যা সমকালীন ইতিহাসের বিচারে অতুলনীয়[৫]। কিন্তু আমেরিকা স্বাধীনতার পর Jefferson এর যেমন মূল্যায়ন হয়েছে বাংলাদেশে তাজউদ্দীন আহমদকে তেমন মূল্যায়ন করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে গনতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপরে নেমেআসে পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর অমানুষিক আক্রমণ। বঙ্গবন্ধু তাদের হাতে বন্দি হন। তখন দেশবাসীকে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তাজউদ্দীন। দক্ষতার সঙ্গে সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি সমর্থ হন[৬]। তিনি আরও বলেন, তাজউদ্দীন আহমদের কাছে এই জাতির ঋণের স্বীকৃতি আমরা যথাযথভাবে দেইনি'[৭]।

প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ করেও স্বাধীনতা ফিরে পেতে ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালে অনেকটা রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা পাকিস্থানের সাথে রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার উপর আঘাত হানলে ১৯৫২ সালের চূড়ান্ত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি প্রথম বারের মতো 'স্বদেশ যাত্রা'করে। এর পরে একে একে ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-এর ছয় দফা, ৬৯-এর গণ অভুথানের মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্ত্বার উন্মেষ ঘটে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অসম্মত হয়। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান পূর্ব নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। ফলে পূর্ব পাকিস্থানের সাধারণ মানুষ ক্ষোভে রাস্তায় নেমে পড়ে। এবং কার্যত এর পর থেকেই পূর্ব পাকিস্থান বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্থান এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না করে সামরিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্থানকে সমূলে উৎপাটন করতে মনঃস্থির করে। ইয়াহিয়া আলোচনার নামে কাল ক্ষেপণ করে, অন্য দিকে বাঙালির উপরে হামলার জন্য সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে থাকে। এদিকে আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় এবং ৭ মার্চ সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে স্বাধীনতার ইঙ্গিত প্রদান করে বঙ্গবন্ধু। পাশাপাশি আলোচনার দরজা খোলা রাখে। এরই মধ্যে ২৫ মার্চ গভীর রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ইতিহাসের নারকীয় হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে বঙ্গবন্ধু আত্নগোপনে যেতে সম্মত না হলে তাজউদ্দীন মেজাজ খারাপ করে সাত মসজিদ রোডের বাসায় ফিরে আসে[৮]। কিছুক্ষণ পরে আমীর-উল ইসলাম ও কামাল হোসেন তাজউদ্দীনের বাসায় যান। এরই মধ্যে যখন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ মোজাফফর সাহেব পাকিস্থানি বাহিনী ইপিআরকে নিরস্ত্র করার খবর দেন তখন তাজউদ্দীন খুবই আশান্বিত হন। সাথে সাথে রাজারবাগের পুলিশের প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা শুনতে পান। তখন তাজউদ্দীন ভাবেন ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাঙালি আজ যুদ্ধের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত। তাই তিনি অনেকটা সশস্ত্র অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হয়ে যান অজানার পথে। ২৭ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত হন। ২৫ মার্চ রাতেই ওয়ারলেস মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পর দিন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নানসহ অনেকেই বেতারে পাঠ করেন এবং লিফলেট বিলি করে প্রচার করা হয়।

সরকার গঠন করা কেন প্রয়োজন ছিলঃ

তাজউদ্দীন আহমদ ২৫ মার্চ বাড়ি থেকে বের হয়ে ফরিদপুর হয়ে কুষ্টিয়া সীমান্তে ৩০ মার্চ আসেন আমীর-উল ইসলামকে সাথে নিয়ে। এ সময় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করেন এবং যুদ্ধ কীভাবে পরিচালনা করবেন তার পরিকল্পনা করেন। তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন দেখে খুব উদ্বুদ্ধ হন। সাধারণ মানুষ গুলোকে হঠাৎ অসাধারণ হয়ে উঠতে দেখে তিনি ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির পথ তৈরি করতে থাকলেন। ৭ মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। তাজউদ্দীন উপলব্ধি করেন এখন এই যুদ্ধকে পরিকল্পিত জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে। অপরিকল্পিত যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাস্ত করা যাবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংগঠিত করতে হবে তার জন্যে চাই একটি সরকারের। তাছাড়া আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করতে একটি সামরিক বাহিনী

গঠন করার খুব প্রয়োজন। অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক রসদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে ভারতীয় সহযোগিতা লাভ। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞের কথা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা ও এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা তখন খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ পশ্চিম বঙ্গসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদেও শরণার্থী হিসেবে গ্রহনের জন্যে ভারতের সহযোগিতার জন্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সরকার অবশ্যক হয়ে পড়ে। সরকার গঠন করা যে কতটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা মোহাম্মদ নুরুল কাদেরের লেখায় বোঝা যায়। তিনি লেখেন, 'পরিকল্পনা করার জন্য প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু যোদ্ধাকে নিয়ে আলোচনায় বসলাম। সৈনিকদের সবারই বক্তব্য, আমরা একটি দেশের সৈনিক। কিন্তু দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে এবং বিবেকের ডাকে বিদ্রোহ করেছি। এর পেছনে আমাদের যত মানসিক শক্তি এবং যুক্তিই থাকুক না কেন আমাদের শক্তি কিন্তু তেমন নেই। আমরা পাকিস্তানিদের দ্বারা প্রায় অবরুদ্ধ। যে কোন মুহূর্তে ওরা আমাদের ধরে ফেলতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এমন কোনো পরিস্থিতি আসে তা হলে আমরা আইনানুগ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবো। কারণ এখানও প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য। ওরা আমাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে বিচার করতে পারে। আর এই বিচারের রায় হবে জঘন্যতম মৃত্যু। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার গঠন অপরিহার্য। আমাদের যদি কেউ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় তাহলে অন্তত প্রতিপক্ষ যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারবে এবং জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে'[৯]। এমতাবস্থায় যদি সরকার গঠন করতে বিলম্ব করা হতো, তাহলে একাধিক আঞ্চলিক সরকার কিংবা বিপ্লবী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা হলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। আর যদি সত্যি তা হতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে যেতো তা বলা শক্ত। এই সকল গুরুত্ব অনুধাবন করে তাজউদ্দীন আহমদ দ্রুত সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তাজুদ্দিন আহমদ একটি স্মৃতিচারণে বলেন, 'যাবার পথে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা লাভের যে চেতনার উন্মেষ দেখে গিয়েছিলাম সেটাই আমাকে আমার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার পথে অনিবার্য সুযোগ দিয়েছিল। জীবননগরের কাছে সীমান্তবর্তী টঙ্গি নামক স্থানে একটি সেতুর নিচে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে আমি সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা হলোঃ একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাজ শুরু করা'[১০]। যদিও তিনি জানতেন মুজিববিহীন আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব দ্বন্দ্ব রয়েছে। কোন কোন নেতা তার সরকার গঠনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে পারেন। সত্যি সত্যি কিছু নেতা বিরোধিতা করেও ছিলেন। এ সংকটের আশঙ্কা থাকার পরেও তাজউদ্দীন আহমদ কাল বিলম্ব না করে, বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সরকার গঠনের জন্য মনস্থির করেন। এ ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন গবেষক কামাল হোসেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে তিনি real politics এর পরিচয় দেন' [১১]।

প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠন ও তাজউদ্দীন আহমদের অবদানঃ

৩০ মার্চ তাজউদ্দীন ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে প্রবেশ করেন একজন আওয়ামী লীগের উচ্চপদস্থ নেতা হিসেবে। তিনি প্রথমে বিএসএফ এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার ও পরে বিএসএফ প্রধান রুস্তমজীর সাথে দেখা করেন। মার্চ মাসে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার কে সি সেনগুপ্তের সাথে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীনের আলোচনা হয়। আলোচনায় বলা হয় পাকিস্তান যদি বাঙালির উপর হামলা করে বাংলাদেশকে ভারত সরকার সাহায্য করবে কিনা। তাজউদ্দীন ভারতে প্রবেশ করে ভারতের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা বুঝতে পারেন সে আলোচনা কোন অগ্রগতি পায় নি। ভারত সরকারও কোন

সাহায্য করার জন্য রাজনৈতিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। মূলত ৩০ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদের ভারতে প্রবেশের পরপরই ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তারা কি ধরনের সহযোগিতা করবে তা ভাবতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলামের প্রত্যক্ষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'Tajuddin and his colleagues, on their arrival in India, had to establish their credentials as the genuine representatives of the party as well as their capacity to lead a war of liberation'[১২]. এ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তাজউদ্দীন দ্রুত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে উদ্যোগী হন এবং ৩ এপ্রিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। দেখা করার আগে উচ্চপদস্থ ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারেন তারা মূলত জানতে চাচ্ছে আওয়ামী লীগ কোন সরকার গঠন করেছে কিনা। তাছাড়া সাক্ষাৎকারের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তাজউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কোন পদাধিকার ব্যক্তি হিসেবে সাক্ষাৎ করবেন? তিনি উপস্থিত বুদ্ধির জোরে ত্বরিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভারত সরকারকে জানাতে বলেন, ২৫-২৬ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠন করেছেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমান সেই সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের সদস্যরা মন্ত্রীপরিষদের সদস্য। একটি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতীয় সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করলে রাজনৈতিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার পথ তৈরি হয় এবং বিশ্ব দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পায় তাই তাজউদ্দীন আহমদ নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এতে আলোচনা অবিস্মরণীয় ভাবেফলপ্রসূ হয়। তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ, সামরিক রসদপত্র, শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয়দান ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় সরকারের সহযোগিতা চান। তাজউদ্দীনের আহমদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতা ইন্দিরা গান্ধীর মনোযোগ আকর্ষণ করে[১৩]। এবং কার্যত এই আলোচনার পরপরই ভারত সরকার প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্যে মুক্তিবাহিনীকে স্বল্প পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করে। দিল্লীতে অবস্থান কালেই তাজউদ্দীন আহমদ রেহমান সোবহান ও আমীর-উল-ইসলামকে দিয়ে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেন। দিল্লীতে থেকে ফিরে এসে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগ নেতাদের খুজে বের করেন। দিল্লী প্রসঙ্গ নিয়ে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করার জন্যে ৮ এপ্রিল কলকাতার ভবানীপুর এলাকার একটি বাড়িতে মিটিংয়ে বসেন। মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন এ এইচ এম কামারুজ্জামান, যুবা নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান ও অন্যান্য নেতারা। সভায় শেখ ফজলুল হক মনি মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধিতা করে বলেন দেশ যুদ্ধরত ও বঙ্গবন্ধু শত্রুর হাতে বন্দি, এখন মন্ত্রিত্ব নিয়ে কলহ না করে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা উচিত। তখন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম মনির প্রস্তাবে বিরোধিতা করে এবং সরকার গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, 'বিপ্লবী কাউন্সিল যদি বিভিন্ন মতাবলম্বী দুটি, পাঁচটি বা সাতটি গঠন করে তাহলে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা কোনটির আদেশ মেনে চলবেন? কোন কাউন্সিলের সাথে বিদেশের সরকার সহযোগিতা করবে? এ ক্ষেত্রে একাধিক কাউন্সিল গঠনের সম্ভবনা নাই? কোন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকার অবমাননা করা হবে'[১৪]। তারপর তাজউদ্দীন সার্বিক পরিস্থিতির ওপরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা দিয়ে শেখ ফজলুল হক মনি ব্যতীত সবাইকে সরকার গঠনের তাৎপর্য বোঝাতে সক্ষম হন। মনি পরে জুন-জুলাই মাসে অন্যান্য যুবানেতাদের নিয়ে মুজিববাহিনী গঠন করে যা সরকারের কোন নির্দেশ পালন করতো না। এই সব সত্ত্বেও তাজউদ্দীন দক্ষতার সাথে সরকার পরিচালনা করে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসে। খন্দকার মোশতাক আহমদও প্রধানমন্ত্রী পদ না পেয়ে সরকার গঠনের বিরোধিতা করে যদিও পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মোশতাক

যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। তাজউদ্দীন আহমদের কর্ম তৎপরতা ও বিচক্ষণতার বলে এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অতঃপর শেখ ফজলুল হক মনির বিরোধিতা সত্ত্বেও ১০ এপ্রিল রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা আকাশবাণীর একটি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। এ ঘোষণার পরপরই মুক্তিযুদ্ধ একটি নতুন মাত্রা পায়। মুক্তিযুদ্ধ নতুন করে গতিশীল হয়ে ওঠে, মুক্তিযোদ্ধারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়। কতোটা উৎসাহিত হয় তা মোহাম্মদ নুরুল কাদেরের লেখায় বোঝা যায়। তিনি লেখেন, 'এই ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষ শুনতে না পেলেও আমাদের মনোবল বেড়ে যায় প্রচণ্ডরকম। এই ঘোষণা শোনার পর আমাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐ সময় আমরা যে কতটা আনন্দিত হয়েছিলাম তা আজও প্রকাশ করতে পারবো না। মনে হয়েছিলো ওই মুহূর্ত থেকেই প্রকৃত অর্থে আমি একজন বাঙালি, একজন স্বাধীন নাগরিক। আমার প্রাণপ্রিয় দেশটির নাম বাংলাদেশ'[১৫]।

১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহাকুমার বদ্যনাথতলার আম্রকাননে প্রথম বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, তার অনুপস্থিতির কারণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনসুর আলী, অর্থমন্ত্রী হিসেবে এ এইচ এম কামারুজ্জামান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও সেনাপ্রধান হিসেবে আতাউল গনি ওসমানী শপথ গ্রহণ করেন। তাজউদ্দীন আহমদের পরামর্শে আমীর-উল ইসলাম ও আব্দুল মান্নান ৫০-৬০টি গাড়ি করে বিদেশী সাংবাদিকদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে ব্যাপক সাহায্য করে। যার পুরো কৃতিত্বের দাবীদার তাজউদ্দীন আহমদ।

আমেরিকার স্বাধীনতাপত্রের রচয়িতা William Jefferson তাদের বিপ্লবী সরকার গঠনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'when in the course of events, its becomes necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation'[১৬]. তেমনি তাজউদ্দীন আহমদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বলেন, 'তাদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্থান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য'[১৭]। তিনি আরও বলেন, কারো তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্ন-নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না'[১৮]।

মন্ত্রীপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরপরই কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী তার সকল স্তরের বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করলে বিশ্বে বাংলাদেশ

সরকারের শপথ গ্রহণ যেমন আলোড়ন সৃষ্টি তেমন বাংলাদেশের কূটনীতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আর এই তাৎপর্যপূর্ণ কাজটা মূলত তাজউদ্দীন আহমদের কূটনৈতিক জ্ঞানের কারণেই সম্ভব হয়। তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার দক্ষতার সাথে দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রীপরিষদ সচিবালায় গঠন, দেশকে ১১ সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচালনা, ৯টি প্রশাসনিক জোন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রানালয়, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কমিটি, উদ্বাস্তু কল্যাণ বোর্ড, কৃষি বিভাগ, পরিকল্পনা সেল, বানিজ্য বোর্ড ইত্যাদি গঠন করে ৯ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত বিজয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। কিন্তু এই হাজার বছরের মধ্যে বাঙালির জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস। এই সময় বাংলাদেশকে নেতৃত্ব প্রদান করতে সরকার গঠন করে তাজউদ্দীন আহমদ। এই সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং পলাশীর প্রান্তরে যেই বাঙালি স্বাধীনতা হারায় তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে বাঙালি সেই স্বাধীনতা আবার অর্জন করে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে। ৭১ এর সেই উত্তাল সময়ে, কঠিন সময়ে তাজউদ্দীন ব্যতীত আর কেউ সেই সময় দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারতো কিনা বলা শক্ত। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ নূরুল কাদেরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ এর রাতে এর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হতে সাহায্য করে, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের একচ্ছত্র নেতা বানিয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদের জায়গায় অন্য কেউ, এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থাকলেও, অত সুষ্ঠুভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়তো বা, পারতেন না। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে যে সকল কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই সকল পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে, সব কিছু ঠাণ্ডা মাথায় বিচার, বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা বাস্তবায়নের জন্যে নেতৃত্বের যে দৃঢ়তা ও কঠোরতার প্রয়োজন ছিল, তা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেখতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু, হয়তো বা, অত কঠোর হতে পারতেন না। কারণ বঙ্গবন্ধু মনের দিক দিয়ে অত্যন্ত কোমল, স্নেহপ্রবণ ও আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন’[১৯]।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর Jefferson কে জাতির পিতায় আখ্যায়িত করা হয়[২০]। বাংলাদেশে তাজউদ্দীন আহমদকে জাতীয় নেতায় আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আমেরিকায় Jefferson এর জীবন ও কর্মকে নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেভাবে আলোচনা হয়, তাজউদ্দীন আহমদের জীবন-কর্ম ও স্বদেশ ভাবনা নিয়ে তেমন আলোচনা বা গবেষণা হয় না। রাষ্ট্রীয় ভাবে চর্চা করা হয় না তাজউদ্দীনের জীবন ও কর্ম নিয়ে। ফলে বাংলাদেশে আজ আর তাজউদ্দীন আহমদের মতো আদর্শ নেতা বেড়ে উঠছে না। তাই আমরা যদি সত্যি একটি সোনার বাংলাদেশ চাই, তাহলে তাজউদ্দীন আহমদের মতো আদর্শ নেতা আজ আমাদের বড়ই দরকার। তাই এমন আদর্শ নেতা পেতে আমাদের তাজউদ্দীন আহমদের জীবন-দর্শন পাঠ অত্যাবশ্যক।

তথ্যসূত্রঃ

১। এইচ টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশ, ২০০৪), পৃ-৬২।

২। সিরাজুল ইসলাম, ঐতিহাসিকের নোটবুক, (ঢাকাঃ কথা প্রকাশ, ২০১০), পৃ-১৭২

৩। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭২

৪। কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর, (ঢাকাঃ অঙ্কুর প্রকাশ, ২০০৮), পৃ-২৮৮।

৫। এইচ টি ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩

৬। কামাল হোসেন,তাজউদ্দীন আহমদঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর, এই বইয়ের মুখবন্ধ লেখেছেন ড আনিসুজ্জামান। সেখানে তিনি তাজউদ্দীন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, পৃ-xv

৭।কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ-xv

৮। মঈদুল হাসান, মূলধারা ৭১, (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ-০৯

৯। মুহাম্মদ নুরুল কাদির, একাত্তর আমার, (ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ-৪০

১০। দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

১১। কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৪

১২। Nurul Islam, Making of a Nation-Bangladesh: An Economist's tale (Dhaka: The University Press Limited, ২০০৩), p-১১৫

১৩। কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৬

১৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত স্বাধীনতার দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১১১।

১৫। নুরুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ-৪২

১৬। মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ-৬৭১

১৭। শারমিন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদঃ নেতা ও পিতা, (ঢাকাঃ ঐতিহ্য প্রকাশ, ২০১৪), পৃ-৩১৯

১৮। শারমিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৩২০

১৯। মোহাম্মদ নুরুল কাদের, ২৬৬ দিনে স্বাধীনতা, (ঢাকাঃ মুক্ত প্রকাশ, ২০০৭), পৃ-৬৭।

২০। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৯